আন্তর্বিদ্যা

www.debracollege.ac.in

Doi: https://doi.org/10.5281/zenodo.15812638

বঙ্গভূমির পটভূমিতে কবিকঙ্কন মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল

অভিষেক মুসিব, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ডেবরা থানা শহীদ ক্ষুদিরাম স্মৃতি মহাবিদ্যালয়

Submitted on: 24.01.2025

Accepted on 20.03.2025

সংক্ষিপ্তসার- *আমার এই প্রবন্ধে দেখানো হয়েছে কবি মুকুন্দ চন্ডীমঙ্গলের মধ্যে কীভাবে সামাজিক ইতিহাস ও আঞ্চলিক ইতিহাসকে তুলে এনেছেন। মধ্যযুগে বাংলার সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার জাতিগত চেহারা নিম্নবিত্তদের কাছে অভিশাপ নিয়ে এসেছিল। মোঘল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় শাসনের অধীন বাংলার সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার ভয়াবহ প্রতিফলন কবির নিজের জীবনে দেখতে পাই। কাব্যের গ্রন্থোৎপত্তি অংশ তৎকালীন বাংলার রাজনৈতিক অত্যাচারের দলিল স্বরূপ। কবি মুকুন্দ রচিত 'চন্ডীমঙ্গল' আর্যেতর দেবী চন্ডীর উত্তরণের পাশাপাশি তৎকালীন সমাজ জীবনে নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে সাধারণ মানুষের উত্তরণের ইতিহাস এর মধ্যে চিত্রিত। কালকেতু চরিত্রটি তারই বাস্তব প্রতিফলন। ধর্মীয় বিদ্বেষের চেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছিল জীবিকা ও পেশার দ্বারা মানুষের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। কালকেতুর সমাজের গল্প কিভাবে দক্ষিণ রাঢ় বলয়ের ভূমি সংস্থানের সঙ্গে মানানসই হয়ে উঠেছে সেটিও এই প্রবন্ধের অন্যতম আলোচ্য। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে বাংলার অরণ্যচারী মানুষদের সমাজজীবনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই চন্ডীমঙ্গলের ব্যাধ-খন্ডের আখ্যান কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। বণিকখন্ডে বাংলার বাণিজ্য অবস্থাকে কবি মুকুন্দ ধনপতির বানিজ্য-যাত্রার মধ্যে সুস্পষ্ট দেখিয়েছেন। ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা ও মুদ্রা বিনিময়ের ফলে সমাজে অর্থনৈতিক ধারা কিছুটা হলেও সচল ছিল। কৃষি ও বাণিজ্যই ছিল অর্থনীতির মূল ভিত্তি। ষোড়শ শতাব্দীর পর বাংলার বাণিজ্যে ক্রমশ ভাটা পড়তে থাকে এবং রাজ পৃষ্ঠপোষকতা না পাওয়ার দরুণ বাংলার বাণিজ্যেও বেহাল দশা আসে।*

সূচক শব্দ- *আর্যেতর, অর্থনীতি, ভূ-খন্ড, সামন্ততান্ত্রিক- সমাজ, জীবিকা ও পেশা, বাণিজ্য।*

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য আধ্যাত্মিকতার অন্তরালে লৌকিক জন-জীবনের আখ্যান। সময় এবং সমাজের যুগলবন্দির ঘেরাটোপে কবিদের কলমে বেরিয়ে এসেছে দেব-দেবীর মাহাত্ম্যের অন্তরালে বাংলার সামাজিক রাষ্ট্রিক ইতিহাস। পৌরাণিক ছাঁচে বাংলার লোকায়ত দেব-দেবীর সংস্কার ও সমন্বয়ের দ্বারা আর্যেতর দেবীর

Doi: https://doi.org/10.5281/zenodo.15812638

পৌরাণিক দেবীতে পরিণত হওয়ার ইতিহাস যেমন রয়েছে মঙ্গলকাব্যগুলিতে তেমনি ধরা আছে সমাজে আর্যেতর শ্রেণির আর্যীকরণের ইতিহাস। কবিরা মঙ্গলকাব্যের পটভূমিতে তৎকালীন বাংলার বৃহত্তর লোকসমাজকে উপস্থাপিত করেছেন। ধর্মকে কেন্দ্র করে তৎকালীন রাজনৈতিক, আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতকে চিহ্নিত করে দেয় মঙ্গলকাব্য। সমাজ জীবন থেকে উঠে আসা ইতিহাসের বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য তথ্য ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সঙ্গে জড়িত হয়ে থাকে মানব সভ্যতার সমাজ বিবর্তনের ইতিহাস। কবি মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল সেই বিবর্তনের ইতিহাসকেই দেখায়। ষোড়শ শতাব্দীতে চৈতন্য প্রবর্তিত ধর্মীয় রেনেশাঁস বাঙালির জাতীয় জীবনে যে ঢেউ-এর সঞ্চার করেছিল তাকে অনেকটাই দমিয়ে দেয় মোঘল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় শাসনের অধীন বাংলার সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা। ধর্ম ও অর্থের টানাপোড়েনে বাঙালি মন তখন দিশেহারা। এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছিল রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অত্যাচার। ষোড়শ শতাব্দীতে কবি মুকুন্দ রচিত 'চণ্ডীমঙ্গল' আর্যেতর দেবী চণ্ডীর উত্তরণের পাশাপাশি তৎকালীন সমাজ জীবনে সাধারণ মানুষের উত্তরণের ইতিহাসও এর মধ্যে চিত্রিত। কবি কবি মুকুন্দ সেই ইতিহাসকে গোপন করেননি। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে ব্রাহ্মণ্য সমাজে প্রতিষ্ঠানলাভকারিনী দেবী চন্ডীর প্রকৃত রূপ জানতে গিয়ে অনেক সমালোচনা ও বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। বেশিরভাগ সাহিত্য সমালোচক দেবী চন্ডীর উদ্ভব সম্পর্কে আর্য উৎস ও আর্যেতর উৎসের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। কোনো কোনো সমালোচকের মতে মার্কেন্ডেয় পুরাণে বর্ণিত চন্ডীদেবীই হল এই চান্ডীদেবী, আবার কারো মতে ছোটনাগপুর উপজাতির মধ্যে চান্ডী নামে যে লৌকিক দেবতার পূজা প্রচলিত আছে যা মূলত অষ্ট্রিক বা দ্রাবিড় গোষ্ঠীর দেবী, চান্ডীর উৎস সেখান থেকেই। দেবী চণ্ডীর প্রকৃত রূপ যাই হোক না কেন মোটামুটি বলা যেতে পারে মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত দেবী চণ্ডী এক মিশ্র দেবী। এই মিশ্র দেবীর উদ্ভবের পশ্চাতে রয়ে গেছে তৎকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অবশ্যই আঞ্চলিক ইতিহাস। বিদেশী বিধর্মীদের আক্রমণে বিপর্যস্ত উচ্চবর্ণের সমাজ নিজেদের সুবিধার্থে বা কখনো নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য নিম্নবর্ণের মানুষকে কাছে টেনে নিয়েছিল। এই আর্যীকরণের ইতিহাস তুর্কী আক্রমণের পরবর্তী মধ্যযুগে সমগ্র বাংলা সাহিত্যে কমবেশি পরিমাণে দেখা যায়।

কবি বা সাহিত্যিক মাত্রই নির্দিষ্ট সমাজ প্রতিবেশে তার রচনাকে উপস্থাপিত করেন। নির্দিষ্ট সমাজ পরিবেশে গড়ে ওঠে কবির মানসমণ্ডল। কবি মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল নির্দিষ্ট অঞ্চলের পটভূমিতে গড়ে ওঠেনি। কবি তাঁর কাব্যকে এক জায়গায় নির্দিষ্ট কোনো ফ্রেমে রাখেননি। কবির নিজ বাসভূমি বর্ধমানের দামুন্যা থেকে মেদিনীপুর জেলার আরড়া রাজ বাঁকুড়া রায়ের আশ্রয় গ্রহণ ও রাজসভাকবি হিসাবে নিযুক্ত হওয়ার যে ইতিহাস তা রাঢ়বঙ্গের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কাব্যের পৌরাণিক খণ্ডকে বাদ দিলে আখেটিক খণ্ডের মূল ঘটনাস্থল মেদিনীপুর সীমান্ত কলিঙ্গ ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল। কালকেতু –ফুল্লরার মধ্য দিয়ে রাঢ় বাংলার অরণ্যচারী জনজীবনের কথাকে এই খন্ডে বিশেষভাবে প্রকাশ করা হয়েছে।বাস্তব জীবনে কবি কবি মুকুন্দ যে সমাজ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল তারই নিরিখে রাঢ় বাংলার ভৌগোলিক সীমারেখাকে ব্যবহার করেছেন কাব্যের উপযোগী করে। তবে কাহিনী যে সবসময় বাংলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে এমন নয়। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে বাংলার অরণ্যচারী মানুষদের সমাজ জীবনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই চন্ডীমঙ্গলের আখ্যান কাঠামো গড়ে উঠেছে। কালকেতুর আদর্শ গুজরাট নগরে আদৌ গুজরাট রাজ্যের ছায়া আছে কিনা নাকি বাংলার কোনো কোনো অঞ্চলের মধ্য দিয়ে একটি আদর্শ নগর নির্মাণের ইঙ্গিত সে বিষয় পরে আলোচ্য। চন্ডীমঙ্গলের পৌরাণিক খণ্ড ব্যতিরেকে কবি কবি মুকুন্দ পটভূমিরূপে বর্তমান বাংলার দক্ষিন-পশ্চিম অঞ্চলকে উপস্থাপিত করেছেন। রাঢ় অঞ্চলের ইতিহাসের তথ্যে না গিয়ে ভৌগোলিক সীমানা দ্বারা রাঢ় অঞ্চলকে চিহ্নিত করা যায়। 'উত্তরে বীরভূমের ময়ূরাক্ষী সীমা, দক্ষিণে মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম মহকুমা, পূর্বে বর্ধমান ও হুগলীর আরামবাগ থেকে পশ্চিমে পুরুলিয়া সীমান্ত'- এ হল

লাল কাঁকুরে মাটির দেশ সব মিলিয়ে বৃহত্তর রাঢ় অঞ্চল।' কালকেতুর সমাজের গল্প দক্ষিণ রাঢ়ের।[i] এরই প্রান্তে বিজুবন এবং কলিঙ্গের সীমা। বিজুবন কেটে কালকেতুর গুজরাট নগর স্থাপন, দক্ষিণরাঢ় বলয়ের ভূমি সংস্থানের সঙ্গে একেবারে মানানসই[ii]।

বণিকখন্ডের কাহিনীতে সমাজের উচ্চস্থানীয় প্রতিনিধিদের প্রাধান্য। উঠে এসেছে বাংলার নগরজীবন। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে বর্ণিত নাগরিক সমাজের সঙ্গে কবি মুকুন্দের চন্ডীমঙ্গলে বর্ণিত নগর জীবন একটু আলাদা। ভারতচন্দ্র কোনো বণিক চরিত্রকে উপস্থাপিত করেননি, সেখানে রাজা, রাজসভাসদ প্রধান। আর চণ্ডীমঙ্গলে বণিকখণ্ডের কাহিনী যাতায়াত করেছে বণিক সমাজের মধ্য দিয়ে। অষ্টাদশ শতকে বঙ্গদেশের বহির্বাণিজ্য ক্রমশ ধসে পড়ছিল, বৈদেশিক বাণিজ্যের আঘাতে বাংলার বাণিজ্যের তখন শোচনীয় অবস্থা। সে কারণে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে কোনো বণিক চরিত্রের উল্লেখ পাইনা। বণিকখণ্ডের ধনপতি –শ্রীমন্ত কাহিনীতে ইছানি ও উজানি নগরের উল্লেখ রয়েছে। ইছানি ও উজানি সেই সময় বাংলার অতি সমৃদ্ধশালী দুটি নগর। ধনপতি সদাগর খুল্লনার কাছে নিজের পরিচয় সম্পর্কে জানিয়েছিলেন-

সাধু ধনপতি আমি বাস হে উজানি
গন্ধবণিক জাতি বিদিত অবনী।।

এই উজানি শহরটি বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার মঙ্গলকোট থানার অন্তর্গত উজানি কোগ্রাম (কোগাঁ নামে পরিচিত)। অজয় নদীরতীরে কোগাঁ[iii]। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বলা হয়েছে 'গৌড়ে বিখ্যাত যার স্থান উজানি' অর্থাৎ এই উজানি নগর গৌড়বঙ্গের অন্তর্গত কোনো একটি নগর। ভবিষ্যপুরাণের বর্ণনায় গৌড় বর্ধমানের উত্তরে ও পদ্মানদীর দক্ষিণে অবস্থিত। মুরারিমিশ্রের 'অনর্ঘরাঘব' থেকে জানা যায় চম্পা ছিল গৌড়ের রাজধানী। ধনপতি যখন গৌড়ের রাজদরবারে যায় সেই যাত্রাপথের বিবরণে বড়গঙ্গার কথা উল্লিখিত হয় –'বড় গঙ্গা পার হয়্যা গৌড় প্রবেশে'। উল্লেখ্য পঞ্চদশ শতকের গোড়াতেই পদ্মা বৃহত্তরা নদী এবং বড়গঙ্গা নামে পরিচিত[iv]। বণিকখন্ডে কাব্যের পরিসর অনেক বেশি। কাহিনী গৌড় প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে বর্ধমান ও হুগলী জেলার মধ্যে প্রসারিত হয়েছে। এর কিছু কারণ ছিল। বণিকখন্ড বণিকসমাজের গল্প ; বর্ধমান ও হুগলী জেলাকে কেন্দ্র করে মধ্যযুগে একটি অত্যন্ত শক্তিশালী সংঘবদ্ধ বণিক সমাজ গড়ে উঠেছিল। মধ্যযুগে বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাসে এই বণিকেরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। উজানি নগরে স্বর্ণবণিকদের প্রভাব বেশি ছিল। ধনপতি সদাগর পাঁচজন সুবর্নবণিককে গৌড় থেকে উজানিনগরে নিয়ে আসেন। বর্ধমান, চম্পাই, কর্জনা, গনপুর, সিতুনপুর, পাঁচড়া, সপ্তগ্রাম, উজানি, ইছানি, বড়সুল, ফতেপুর, গণেশপুর, দশঘরা, সাঁকো, কাইতি, ত্রিবেনী, লাউগ্রাম, বিষ্ণুপুর, খন্ডকোষ এবং গৌড়ে এই বণিকদের বাসস্থান ছিল। বঙ্গদেশে বাণিজ্যিক সুবিধার জন্য নদীকেন্দ্রিক অঞ্চলগুলিতে বণিকসম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল। সেই সময় বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্য জলপথের মাধ্যমেই বেশি সম্পন্ন হত। ধনপতি ও শ্রীমন্তের সিংহল যাত্রাপথে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের উল্লেখ রয়েছে। চণ্ডীমঙ্গলে ধনপতির সিংহল যাত্রাপথের বিবরণ নিম্নরূপ উজানী – ইন্দ্রানী- চণ্ডীগাছা- নবদ্বীপ – পাড়পুর– সমুদ্রগড়ি- আম্বুয়ামুলিক- শান্তিপুর- গুপ্তিপাড়া- কুলিয়া- মহেশপুর– ফুলিয়া- হালিশহর- ত্রিবেণী (দক্ষিণে) সপ্তগ্রাম- নিমাইতীর্থ- মাহেশ (ডাহিনে) খড়দহ- কোন্নগর- কুচিগ্রাম- চিত্রপুর- সালিখা- কলিকাতা- বেতড়- হিংজুলি- বালীঘাটা– কালীঘাট- মাইনার- নাচনগাদা- বৈষ্ণবঘাটা- বারাসত- ছত্রভোগ- হাতেঘর- মগরা– সঙ্কেতমাধব- কলাহাট- ধূলিগ্রাম ফিরিঙ্গিদেশ দ্রাবিড়দেশ- সেতুবন্ধ- চন্দ্রকূটপর্বত- সীতাখালি- কালীদহ- সিংহল। শ্রীমন্তের সিংহল যাত্রাপথের বিবরণও প্রায় অনুরূপ। এই যাত্রাপথের বাস্তব অভিজ্ঞতা কবির ছিল না। কিন্তু ইতিহাসে এই যাত্রাপথের বিবরণের উল্লেখ আছে। বাংলার প্রাচীণ বাণিজ্য পথের সন্ধান দেয় ধনপতির গল্প।

Doi: https://doi.org/10.5281/zenodo.15812638

অন্ত্যজ সমাজের দারিদ্র্য স্বরূপ ফুল্লরার বারমাস্যা অংশে বর্ণিত। কালকেতু উপাখ্যানে ফুল্লরার বারো মাসের দুঃখ বর্ণণায় মূলত অন্ন ও বস্ত্রের অভাবের কথাই ফুটে উঠেছে। ফুল্লরার দারিদ্র্য জীবন দেখানো হলেও তা মধ্যযুগের সার্বিক সমাজের চিত্র ছিল না। আকবর প্রবর্তিত ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা ও মুদ্রা বিনিময়ের ফলে সমাজে অর্থনৈতিক ধারা কিছুটা হলেও সচল ছিল। তৎকালীন সময়ে কৃষি ও বাণিজ্যই ছিল অর্থনীতির মূল ভিত্তি। বাণিজ্যের দিক থেকে বণিকদের দ্বারাই বাংলায় একটি আন্তর্জাতিক বাজার গড়ে উঠেছিল। চন্ডীমঙ্গলে বিভিন্ন আমদানি ও রপ্তানিজাত দ্রব্যের উল্লেখ পাই। আমদানিজাত দ্রব্য যথা শঙ্খ, লবঙ্গ, জায়ফল, শ্বেতচামর, সৈন্ধব লবন, জিরা, হীরা, চন্দন, মুক্তা, কুরুঙ্গ, শুয়া, কর্পুর, পাখরি ইত্যাদি আর রপ্তানি দ্রব্য রূপে পাই ঘোড়া, রাজহংস, ঘুঘু, পায়রা, হরিণ, বাঘ, সিংহ, বাজপাখি, কপোত, আম, তাল, কলা, কুল, নারিকেল, ঘৃত, দুধ, মধু, যব, সরিষা, তিল, ছোলা, মুসুর, মুগ, বরবটি, পান, সুপারি, পাট, কাঁচ, লবণ, সিন্দুর, বস্ত্র প্রভৃতি দ্রব্য। রপ্তানীজাত দ্রব্যগুলি থেকে অনুমান করা যায় তৎকালীন বাংলায় কৃষিব্যবস্থা উন্নত ছিল। ষোড়শ শতাব্দীর পর স্বাধীন রাজার প্রয়োগ নীতি বন্ধ হয়ে যায়। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় যে রাজ্যশাসন বঙ্গদেশে চলতে থাকে তা মূলত করদ রাজ্য। প্রত্যেক সামন্তপ্রভু প্রজার উপর অতিরিক্ত করের বোঝা চাপিয়ে দেওয়ায় বাংলার অর্থনীতিরও বেহাল দশা ঘটে। ষোড়শ শতাব্দীর পর বাংলার বাণিজ্যে ক্রমশ ভাটা পড়তে থাকে। রাজপৃষ্ঠপোষকতা না পাওয়ার দরুণ বাণিজ্যেও একরকম বেহাল অবস্থা তৈরি হয়। পূর্ববর্তী সমাজ ব্যবস্থায় বাণিজ্যে যা আমদানি রপ্তানী হয় তা পুরোপুরি রাজার সম্পত্তির অধীন। এই দিক দিয়ে মনসামঙ্গলের চাঁদসদাগরের সঙ্গে চণ্ডীমঙ্গলের ধনপতির পার্থক্য রয়েছে। চাঁদসদাগরকে রাজনির্দেশে কোথাও বাণিজ্যে বের হতে হয়নি তার নিজের বাণিজ্য তরী রয়েছে, কৃষি ও বাণিজ্যের স্বাধীন অর্থনীতিতে সে স্বাধীন, বণিক হয়েও সে রাজা। অপরদিকে চণ্ডীমঙ্গলের ধনপতি সদাগর একজন বিলাসী পুরুষ যে পায়রা উড়িয়ে পাশা খেলে সময় কাটায়। স্বাধীন অর্থনীতি এখানে বিপর্যস্ত। ধনপতির কৃষি নেই, বাণিজ্যও সেভাবে দেখি না। আর তাছাড়া ধনপতি সদাগর বাণিজ্যের জন্য সিংহলে যায়নি, গিয়েছিল রাজার নির্দেশে চন্দনকাঠ আনতে। ধনপতির মত শ্রীমন্তকেও গৌড়ে যেতে হয়। বলা যেতে পারে গৌড়ের রাজদরবারে যাওয়াটা এদের কাছে ছিল বাধ্যতামূলক। শ্রীমন্তও বাণিজ্যের জন্য সিংহলে যায়নি, গিয়েছিল নিজের পিতাকে খুঁজে আনার জন্য। সুতরাং পূর্বে বণিক সমাজের যে স্বাধীনতা ছিল পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে সেই স্বাধীনবণিক বৃত্তির অবসান ঘটে। সুতরাং 'মনসামঙ্গল'-এর চাঁদসদাগরের কাহিনী সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার পূর্ববর্তী বাংলার বণিকপ্রাধান্য সমাজের গল্প, 'চণ্ডীমঙ্গল'-এর ধনপতি সদাগরের কাহিনী সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় বণিকসমাজের কাহিনী।

বিশেষ এক রাজনৈতিক পরিবেশে কবি কবি মুকুন্দকে দামুন্যা ছেড়ে আড়রা ভূমিতে যেতে হয়। কবির কাছে এই যাত্রাপথ মোটেই সুখের ছিল না। তৎকালীন রাজনৈতিক অত্যাচার প্রজার জীবনে যে কি ভয়ঙ্কর অভিশাপ নিয়ে এসেছিল তার প্রমাণ কবি মুকুন্দ নিজেই। কাব্যের গ্রন্থ উৎপত্তি অংশে তার পরিচয় আমরা পাই। মেদিনীপুরের সেলিমবাদ পরগণায় সম্ভবত গোপীনাথ নন্দী দামুন্যার তালুকদার ছিলেন। সঠিক সময়ে রাজস্ব জমা না পড়লে জমিদার বা ডিহিদারের কাছ থেকে তালুকদাররা রেহাই পেতেন না। সম্ভবত রাজস্ব না দেওয়ার কারণে চন্ডীমঙ্গল কাব্যে উল্লিখত তালুকদার গোপীনাথ নন্দী বন্দী হয়েছিলেন। রাজস্ব আদায় সঠিকমতো না হলে সবচেয়ে বেশি প্রজাপীড়ন করত ডিহিদারেরা। ছোটো ছোটো কয়েকটি গ্রাম নিয়ে গড়ে উঠত মৌজা আর এই মৌজার অধিপতি হতেন ডিহিদার। কবি জানিয়েছেন-

‘ধন্য রাজা মানসিংহঃ বিষ্ণুপদাম্বুজভৃঙ্গঃ গৌড় বঙ্গ উৎকল অধিক।
সে মানসিংহের কালেঃ প্রজার পাপের ফলেঃ ডিহিদার মামুদ সরিপ।।

রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অত্যাচার থেকে মুক্তি পেতে কবি দামুন্যা ত্যাগ করে সপরিবারে আরড়ায় এসে উপনীত হন। আড়রা প্রদেশ উড়িষ্যা সুবার অন্তর্গত ছিল। প্রজার উপর অত্যাচারের মাত্রা বোঝাতে গিয়ে কবি উল্লেখ করেছেন সমাজ শোষণের এক বিকৃত রূপ –

উজির হল রায়জাদাঃ বেপারিয়ে দেয় খেদাঃ ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হল্য অরি ।
মাপে কোনে দিয়ে দড়াঃ পনর কাঠায় কুড়াঃ নাহি শুনে প্রজার গোহারি ।।
সরকার হইলা কালঃ খিল ভূমে লেখে লালঃ বিনা উপকারে খায় ধুতি ।
পোদ্দার হইল যমঃ টাকা আড়াই আনা কমঃ পায় লভ্য লয় দিন প্রতি ।।

ষোড়শ শতকে আকবর কর্তৃক প্রবর্তিত মনসবদারী ও জায়গিরদারি ব্যবস্থায় সামন্ততান্ত্রিক সমাজে বেশ কিছু মধ্যবিত্ত ভুঁইফোড় সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটে। এরা রাজস্ব আদায়ের জন্য অধস্তন কর্মচারীদের উপর চাপ দিতে থাকে যার ফল ভোগ করে প্রজারা। রাজস্ব দিতে না পারলে অত্যাচারের মাত্রা প্রবল হয়ে উঠত। কবি কবি মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের গ্রন্থোৎপত্তি অংশ তৎকালীন বাংলার রাজনৈতিক অত্যাচারের দলিল স্বরূপ। এ কবির বাস্তব অভিজ্ঞতা। বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষ অভিশপ্ত জীবন কবি কোনোদিন ভুলতে পারেননি। তৎকালীন সমাজে আদর্শ রাজার নেতৃত্বে প্রজাদের সুখে থাকার যে স্বপ্ন কবি দেখতে চেয়েছিলেন পরবর্তীকালে তাকেই বোধহয় নির্মাণ করেছেন কালকেতুর গুজরাট নগর প্রতিস্থাপনের মধ্য দিয়ে যেখানে অন্তত রাজস্ব মেটাতে গিয়ে প্রজাকে সর্বস্বান্ত হতে হবে না। কিন্তু পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে জায়গীরদারি প্রথায় সে ব্যবস্থা ছিল অসম্ভব, তাই কবির সেই আদর্শ নগর নির্মাণের পিছনে অলৌকিক কাহিনীরূপে দেবীচণ্ডীর কৃপাকে জুড়ে দিতে হয়। দেবীচণ্ডীর কৃপার উপর ভর করে প্রজাদের প্রতি কালকেতুর আহ্বান-

আমার নগর বৈস জত ভূমি চাষ চষ
সাত সন বই দিয় কর ।
হাল পীছে এক তঙ্কা না করিহ কারে শঙ্কা
পাটায় নিসান মোর ধর ।

শৈশব জীবনে ডিহিদারের অত্যাচারের কথা স্মরণ ছিল বলে তিনি কালকেতুকে দিয়ে বলতে পেরেছিলেন 'ডিহিদার নাহি দিব দেশে'। চণ্ডীর কাছে পশুদের সনির্বন্ধ অনুরোধ অংশটি যেন শোষক সমাজের প্রতি দরিদ্র প্রজার সকরুণ আর্তনাদ। কালকেতুর গুজরাট নগর নির্মানে বহু জাতি ও বহু ধর্মের মানুষ বসবাসের আশায় কালকেতুর আহ্বানে সাড়া দিয়েছে। শুধুমাত্র হিন্দু প্রজাই নয় সেখানে মুসলিম প্রজাবর্গও সাদরে স্থান পেয়েছে। বিচিত্র জাতি ও বহু বর্ণের মানুষের একত্রে অবস্থান গ্রামে সম্ভব নয় বলেই হয়তো নগরের পরিকল্পনা। বহু বৃত্তিধারি ও জাতি বর্নের মানুষ নিজেদের আর্থিক স্বচ্ছলতার অভিপ্রায় নিয়ে নগরে উপস্থিত হতে চেয়েছে। কালকেতু প্রতিষ্ঠিত এই নগর কোনও একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য নয়, সব জাতির জন্য সমানাধিকার। এই নগরে যে ভাবে বসতি গঠন করা হয়েছে তা স্বতন্ত্র বসতি-গঠনের পুরাতন ভারতীয় ঐতিহ্য মেনে রেখেই। বিভিন্ন শ্রেণির জন্য বিভিন্ন পাড়া নির্মাণ করা হয়েছে। নগরের পশ্চিমদিকে কালকেতু মুসলিম সম্প্রদায়কে বসতি স্থাপনের জন্য আহ্বান জানায়-'বৈসে যত মুসলমান'। বসবাসের সময় প্রতিটি জাতির শ্রেণি-বর্ণ-স্তর' কে মান্যতা করা হয়েছে। কালকেতুর গুজরাট নগরী যে সত্যিই একটি আদর্শ নগর রাষ্ট্র তা বোঝা যায় লক্ষ মানুষের আগমনে-'ত্যাগ করি কলিঙ্গে /লক্ষ ঘর প্রজাসঙ্গে/একস্থানে করিব বসবাস' একটি নগরে বসবাসের জন্য চাই লক্ষাধিক জনতা। সামন্ততান্ত্রিক অত্যাচার থেকে মুক্তি পেতে সমাজ অভিজ্ঞ মানুষ দলে দলে নগরে ভিড় করতে চেয়েছে। এ হেন নব নির্মিত কালকেতুর প্রত্যাশী গুজরাট নগর গড়ে উঠেছে নদী থেকে কিছুটা দূরে। হয়তো পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতার স্মৃতিতে ধরা আছে পার্শ্ববর্তী কলিঙ্গ নগরের বন্যায় ভেসে যাওয়ার দৃশ্য। তাই আর যাতে নতুন করে কোন দৈব

Doi: https://doi.org/10.5281/zenodo.15812638

বিপাক না আসে সে ভাবনাকে মাথায় রেখে নদী থেকে কিছুটা দূরে গুজরাট নগরকে গড়ে তোলা হয়েছে। গোলাহাটকে কেন্দ্র করে এই নগরায়ণ তৈরি হয়েছে। যত কিছু আমদানি –রপ্তানি ঘটে এই গোলাহাটের মধ্য দিয়ে। কৃষি পন্যের পাশাপাশি 'হীরা-নীলা-মোতি-পলা' এবং প্রয়োজনীয় যুদ্ধাস্ত্র গুলিও এখানে কেনা বেচা হয়। 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ' –এই প্রবাদটিকে সামনে রেখেই গ্রামীণ জীবনধারার বিপরীতে হাঁটতে চেয়েছে নগরের মানুষ।

চন্ডীমঙ্গলের কাহিনীর মধ্যেই উঠে এসেছে তৎকালীন বাংলার সমাজ জীবনের প্রতিচ্ছবি। বর্ণভিত্তিক সামাজিক স্তরভেদে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের পেশাগত পরিচয় পাওয়া যায়। A.K.Nazmul Karim –এর মতে- "The description of how to different functional groups within the village maintained a heir archival relationship is to be found in the writings of the Bengali poet Mukundaram, who composed his epic probably in the sixteenth century (between 1578-1589 A.D) at Burdwan (in west Bengal).The picture drawn by Mukundaram is unique, because there is no other contemporary account giving the details of village –life, as it is existed before it was substantially affected by the impact of Muslim rule " কবি মুকুন্দের চন্ডীমঙ্গলে সামাজিক স্তর বিন্যাসের চিত্রটি সুস্পষ্টভাবে অঙ্কিত। গুজরাট নগর প্রতিষ্ঠার সময় জাতি-বর্ণ প্রথা এবং সামাজিক শ্রেণিবিভাগ দুটিই সমানভাবে দেখানো হয়েছে। ঐতিহাসিক আল-বেরুনী লিখেছেন- 'এদেশে ব্রাম্ভণ, কায়স্থ ও বৈশ্যরা হচ্ছে উচ্চশ্রেণিভুক্ত। আর মেহনতি বা শ্রমজীবী মানুষ হচ্ছে নিম্নশ্রেণিভুক্ত। নিম্নশ্রেণির মানুষকে কোনো বিশেষ বর্ণ বলে গণ্য করা হয় না। পেশা বা জীবিকাই এদের বর্ণ। সমাজে এরা অন্ত্যজ, উচ্চশ্রেণির মানুষকে সেবা করাই এদের কর্তব্য'। কালকেতু নিজে অন্ত্যজ শ্রেণির প্রতিনিধি। আদৌও সমাজের উচ্চস্তরে প্রাধান্য পাবে কিনা এই বিষয়ে সংশয় জাগে –'পুরোহিত কেবা মোর হইবে ব্রাহ্মণ/নিচ উত্তম হয় পাইলে কিবা ধন'। গ্রাম্য পেশায় নিযুক্ত প্রত্যেকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন ছিল। কবি কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী চন্ডীমঙ্গলের কাহিনীর মধ্যে বঙ্গদেশের আঞ্চলিক চিত্রকে স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন। কবি নিজে বর্ণহিন্দুর উচ্চশ্রেণিতে অবস্থান করলেও ব্রাহ্মণদের পাশে শূদ্রদেরকেও এক স্থানে ঠাঁই করে দিয়েছেন। শুধুমাত্র শূদ্ররা নয় , যে বিধর্মী শাসনে তিনি বাস্তুহারা হয়েছিলেন সেই মুসলিম সমাজের সঙ্গে কবির আপোষ করে নিতে অসুবিধে হয় নি। এর কারণ হিসাবে বলা যায় তুর্কি আক্রমণের প্রাথমিক পর্যায়ে যে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ তৈরি হয়েছিল পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে তা অনেকটাই শিথিল হয়ে যায়। হিন্দু সমাজের নিম্নস্তর থেকে মুসলিম সমাজের প্রতি ক্রমশ সহাবস্থানের জায়গা তৈরি হয়ে গিয়েছিল সামাজিক – রাজনৈতিক কারণে। চন্ডীমঙ্গলে কালকেতু যখন নগর নির্মাণ করে তখন হিন্দুদের পাশাপাশি মুসলিম সমাজের জন্যও একটি আলাদা বসতি স্থাপন করে ।কালকেতু নিজে শূদ্র শ্রেণির প্রতিনিধি ।তার কাছে ধর্মীয় বিদ্বেষের চেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছিল জীবিকা ও পেশার দ্বারা মানুষের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা যা মধ্যযুগের বঙ্গদেশে একান্ত অভাব ছিল। কাব্যের মধ্যে দেখা যায় সেকালের শ্রমজীবি মানুষের পরিচয় যথা– সুতায় মাজা দেওয়া, পিঠা বিক্রয় করা, পাট তৈরি করা, তাঁতির চিরুণি প্রস্তুত, কাগজ তৈরি, মৎস্য বিক্রয় ইত্যাদি। মুসলিম সমাজেও নানা বৃত্তি ছিল- 'নানাবৃত্তি করিআ বসিল মুসলমান'। সমাজে রাঢ়ী ও বরেন্দ্রী উভয় শ্রেণির ব্রাহ্মণ বর্তমান ছিল। উল্লেখ্য আদিশূরের সময় যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ পশ্চিম প্রদেশ থেকে এসেছিল তাদের সন্তানরা রাঢ়ী ও বরেন্দ্রী নামে পরিচিত হয়[৮]। ব্রাহ্মণদের অন্যতম বৃত্তি ছিল যজমানী করা। গুজরাট নগরে বিভিন্ন জাতির পরিচয় পাওয়া যায়। যথা তেলি, তাম্বুলি, কুম্ভকার, মালী, বারুই, নাপিত, মোদক, গন্ধবণিক, শঙ্খবণিক, সাঁপুড়ে প্রভৃতি। প্রত্যেকেরই বৃত্তিগত পরিচয় ছিল আলাদা। সমাজে যে কুলীন ও কায়স্থদের বিশেষ প্রভাব ছিল তা ভাঁড়ুদত্তের কথাতেই স্পষ্ট-

'কোনজন সিন্ধুকুল সাধ্য কেহ ধর্মমূল
দোষহীন কায়েস্থের সভা
.....
অনেক কায়স্থ মেলা দেখিআ তোমার খেলা
আইলাম তোমার সন্নিধান ।

চন্ডীমঙ্গলে কায়স্থদের দোকানদার ও বণিকসমাজের মুহুরির কার্য গ্রহণের উল্লেখ রয়েছে। কায়স্থদের মধ্যে অনেক জাতি মিলে মিশে আছে। একদল আদিশূরের পূর্ব থেকেই বঙ্গদেশে ছিল আর একদল যারা আদিশূরের সময় পঞ্চসাগ্নিক বিপ্রের সঙ্গে বঙ্গদেশে এসেছিল[vi]। সমাজে বণিকেরাই ছিল সর্বেসর্বা। তবে বণিক সমাজ আবার চারটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত ছিল। যথা গন্ধবণিক, সুবর্ণবণিক, কাংস্যবণিক, ও শঙ্খবণিক। গন্ধবণিকদের সমাজে উচ্চবর্ণ রূপে বিশেষ খ্যাতি ছিল। এদের আরাধ্যা দেবী ছিল গন্ধেশ্বরী। গন্ধেশ্বরী দেবীকে প্রণাম করে এরা দোকানে বসত[vii]। গন্ধবণিকেরাই সমুদ্রপথে বাণিজ্যে বের হত। ধনপতি সদাগর একজন গন্ধবণিক ছিলেন।

বর্ণভিত্তিক সমাজে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রদের মধ্যে স্বাভাবিক দূরত্ব বজায় ছিল। সমাজে যারা অন্ত্যজ শ্রেণি তারাও দীর্ঘদিনের বঞ্চনা ও সমাজে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই ব্যবস্থাকে তাদের অদৃষ্ট বলেই মেনে নিয়েছিল। তাই কোনো কারণে যদি উচ্চবর্ণ শূদ্রদের সঙ্গে সঙ্গতি স্থাপন করতে চাইত সেক্ষেত্রে অন্ত্যজ শ্রেণির মধ্যে সন্দেহের বাতাবরণ তৈরি হত। তাই দেবী চন্ডী যখন কালকেতুকে তার পূজা প্রচার করতে বলেছেন তখন কালকেতু তার স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত না হয়ে বিস্মিত কণ্ঠে দেবীকে জিজ্ঞাসা করেছে-

'অতি নীচ কুলে জন্ম জাতিতে চোয়াড়।
কেহো না পরশে জল লোকে বলে রাঢ়।।
পুরোধা আমার হবে কেমনে ব্রাহ্মণ
নীচ কি উত্তম হবে পাইলে বহু ধন।।"

দেবী চন্ডীর কাছে কালকেতুর এই প্রশ্নই সমাজে তাদের মত নিম্নজীবী সম্প্রদায়ের অবস্থানকে চিহ্নিত করে দেয়। জাতিগত আভিজাত্যের পরিচয় দেবখন্ডে দক্ষযজ্ঞের কাহিনীর মধ্যেও দেখা যায়। রাজা দক্ষ শিবের হীনজাতি ও অসভ্য আচরণের উল্লেখ করে শিবকে যেভাবে অপমান করে তা আসলে নিম্নবর্ণের প্রতি উচ্চবর্ণের অবজ্ঞা। কালকেতুর মতো অশিক্ষিত গরীব অন্ত্যজ প্রান্তিক শ্রেণির মানুষেরা উচ্চবর্ণের কাছে চিরকাল অবহেলিত থেকে গেছে। শূদ্র সমাজের প্রতি উচ্চবর্ণের যে সংস্কার বোধ বাঙালি মানসে ধরা ছিল কবিকঙ্কন তারই বাস্তব প্রতিফলন দেখিয়েছেন এই অংশে।

বিবাহ বা অন্যান্য অনুষ্ঠানে সামাজিক আচার বিধান জাতিগত পার্থক্যের কারণে ভিন্ন ভিন্ন রীতিতে সম্পন্ন হত। কালকেতুর বিবাহের আয়োজন সারা হয়েছে সংক্ষিপ্তভাবে। বিপুল আড়ম্বর সেখানে নেই বললেই চলে অথচ ধনপতি–খুল্লনার বিয়ের আয়োজনের ক্ষেত্রে কবি বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। সমাজে উচ্চবর্ণের বিবাহে লৌকিক রীতিনীতিকে কবি কোথাও বাদ দেননি। তিনি নিজে একজন ব্রাহ্মণ তাই উচ্চবর্ণের বাঙালি হিন্দুসমাজে বিবাহরীতি তাঁর জানা ছিল। ধনপতি –খুল্লনার বিবাহ অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে মধ্যযুগে বাঙালি সমাজে বিবাহ অনুষ্ঠানে যে সমস্ত সামাজিক রীতিনীতিগুলো প্রচলিত ছিল সেগুলোকে বাস্তবায়িত করা হয়েছে-

পাটে চড়ে রূপবতী প্রদক্ষিণ করে পতি
শুভমুখে দুইজনে ছামনি
দিলেন পতির গলে আপনার কণ্ঠমালে
বামাগণ দিল জয়ধ্বনি।

Doi: https://doi.org/10.5281/zenodo.15812638

হিন্দু বাঙালি সমাজে এই বিবাহ রীতি আজও বর্তমান। কবি মুকুন্দ 'চন্ডীমঙ্গল' কাব্যের দুটি খন্ডে সমাজের দুটি ভিন্ন স্তরের কাহিনী প্রসঙ্গে তাদের জীবনযাত্রার পার্থ্যকের জায়গাটিকে স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন। কালকেতু– ফুল্লরাদের জীবনে সোনা অতি দুর্লভ বস্তু। পিতল, তামা, দস্তা প্রভৃতি ধাতু দ্বারা নির্মিত অলঙ্কারই ছিল তাদের কাছে ঐশ্বর্যস্বরূপ। সোনা, হীরে প্রভৃতি মুল্যবান ধাতুর ব্যবহার তো দূরে থাক, সেগুলি দেখাও ছিল তাদের কাছে সৌভাগ্যের বিষয়। কিন্তু কালকেতু– ফুল্লরা সেই সৌভাগ্য থেকেও বঞ্চিত ছিল। কালকেতু যখন দেবী প্রদত্ত মানিক অঙ্গুরিটি নিয়ে মুরারি শীলের কাছে যায়তখন মুরারি শীল ধাতুর আসল মূল্য বুঝতে পেরে ঠকানোর লোভে কালকেতুর জীবনে পরিচিত একটি ধাতুর কথাই বলেছিল-

সোনা রূপা নহে বাপা এ বেঙ্গা পিতল
ঘষিয়া মাজিয়া বাপু করেছ উজ্জ্বল

মুরারি শীল সচেতন ভাবেই পিতলের পূর্বে 'বেঙ্গা' শব্দটি জুরে দিয়ে কালকেতুকে অন্য পথে চালিত করতে চেয়েছিল। সমাজে মুরারি শীলদের মতো ধূর্ত কপট ব্যবসায়ীর অভাব ছিল না। যে নির্দিষ্ট অঞ্চলে কবি তার জীবন বাস্তবতাকে প্রত্যক্ষ করেছেন স্বাভাবিক ভাবেই সেই অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ কাব্যের মধ্যে স্থান লাভ করেছে। কবি কবি মুকুন্দ রাঢ় বাংলার বিস্তৃত পতভূমিতে তাঁর কাব্য রচনা করেছেন। কাব্যের মধ্যে উঠে এসেছে রাঢ় বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের কথা। রাঢ় বাংলার জঙ্গলাকীর্ন প্রাকৃতিক পরিবেশকে ব্যাধখন্ডে চিত্রিত করা হয়েছে। এক্ষেত্রেও কবিকঙ্কনের বাস্তবতার পরিচয় পাওয়া যায়। ফুল্লরার বারমাস্যা অংশে বাংলার ঋতুবৈচিত্র্যের কথা বলা হয়েছে। বাংলার বারমাসের বৈশিষ্ট্যকে ফুল্লরারা জীবন ধারার সঙ্গে মেলানো হয়েছে। ফুল্লরারা বারোমাস্যারা কাহিনী ঋতুবৈচিত্র্যের দ্বারা বঙ্গদেশের জলবায়ুকে চিহ্নিত করে-

বৈশাখে বসন্ত ঋতু খরতর খরা
ভাদ্র পথ মাসে রামা দুরন্ত বাদল
নদনদী একাকার আট দিকে জল
পৌষে প্রবল শীত সুখী জগজন
তুলি পাড়ি পাছুড়ি শীতের নিবারণ

বর্তমানে জনবসতি ঘন হওয়ার দরুণ জীবিকার সন্ধানে বন কেটে বাসস্থান তৈরি হলেও পঞ্চদশ ষোড়শ শতকে বাংলার বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগ ছিল বনাঞ্চল। সাঁওতাল পরগণা, পশিচম বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমান এবং মানভূম- সিংভূম, এর বেশিরভাগ অঞ্চল ছিল ঘন অরণ্য দ্বারা আবৃত। বাংলার বিস্তৃত রাঢ় অঞ্চলের অরণ্যভূমি ছিল হিংস্র জীবজন্তুদের উপযুক্ত বাসস্থান। কালকেতুর বন কেটে গুজরাট নগর নির্মণ কবিকঙ্কনের কাছে ছিল একটি কল্পিত নগরের সন্ধান। বঙ্গদেশের পশ্চিমাংশ যা পশ্চিম রাঢ় বলে চিহ্নিত সেখানের গ্রামাঞ্চল পার্বত্য অরণ্য প্রদেশ দ্বারা বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে থাকার ফলে বাংলার বেশ কিছু আদিম জনগোষ্ঠী এই অঞ্চলে প্রথম থেকেই বসবাস করতে থাকে। নৃতত্ত্বের বিচারে এই রাঢ় অঞ্চলের আদিবাসীরা ছিল আদি অষ্ট্রেলীয় গোষ্ঠীর অন্তর্গত। এ অঞ্চলের অধিবাসীরা প্রথম থেকেই খুব বলশালী ও যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ছিল। বিভিন্ন হিংস্র জীবজন্তুদের সঙ্গে সংগ্রাম করে এদেরকে জীবন কাটাতে হত। পশ্চিম রাঢ়ের বনাঞ্চলের আদিবাসী মানুষেরা আজও সাপ, বাঘ, হুড়োল প্রভৃতি জীবজন্তুর সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকে। গুজরাট নগর পত্তনকালে কবি কলিঙ্গ রাজের সঙ্গে যুদ্ধের কথা বলেছেন। আমাদের মনে রাখতে হবে মেদিনীপুর জেলার সীমান্তে কলিঙ্গ রাজ্য অবস্থিত। সুতরাং বোঝা যায় কালকেতুর বন কেটে গুজরাট নগর নির্মাণের মধ্য দিয়ে মেদিনীপুর ও উড়িষ্যার সীমান্তবর্তী যে বিস্তীর্ণ জঙ্গলমহল কবি মুকুন্দ হয়তো এখানে সেই অঞ্চলের কথাই বলতে চেয়েছেন। কবি মুকুন্দ নিজে মেদিনীপুর অঞ্চলের আড়রা গ্রামে বাস করেছেন ফলে মেদিনীপুর সংলগ্ন শালবনী, গড়বেতার তৎসংলগ্ন বনাঞ্চল পরিবেশ কবির মানস

স্মৃতিপটে ধরা আছে। তাই পরবর্তী ক্ষেত্রে কালকেতুর মধ্য দিয়ে গুজরাট নগর প্রতিষ্ঠার কথা বলা হলেও আসলে তা মেদিনীপুর সংলগ্ন দক্ষিণ-পশ্চিম বনাঞ্চলকেই চিহ্নিত করে। গুজরাট কবির কল্পিত নগর। সম্ভবত কবির ভাবনায় ছিল সামন্ততান্ত্রিক সমাজে জমিদারের অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি পেতে বাংলার বাইরে কোনো একটি কল্পিত নগরের সন্ধান যা তৎকালীন বাংলার প্রজাদের দিতে পারে মানসিক শান্তি ও আশ্রয়। কালকেতুর মধ্য দিয়ে গুজরাট নগর পত্তন আসলে একজন নিম্নবর্গ শ্রেণিভুক্ত মানুষের সুখে থাকার কল্পনাকেই কবি লিপিবদ্ধ করেছেন কালকেতু আখ্যানের মধ্যে দিয়ে। নিম্নবর্গের মানুষের হাতে সু–শাসনের জন্য অর্থের সদ্ ব্যবহার করা হয়েছে। হয়তো কবি মুকুন্দের চেতনাতে আকবর প্রবর্তিত শাসন ব্যবস্থার ছবি সচেতন ভাবে সক্রিয় ছিল।

---

[i] রাঢ়ের গ্রামদেবতা-ড.মিহির চৌধুরী কামিল্যা ।

[ii] চন্ডীমঙ্গল, অন্তরায়িত ইতিহাস, ড.দ্বীপান্বিতা ঘোষ, বিশ্বনাথ রায় ও আশিষ দে সম্পাদিত, কবিকঙ্কন চন্ডী।

[iii] পশ্চিমবঙ্গ সংস্কৃতি ১ম খন্ড- বিনয় ঘোষ।

[iv] বাঙ্গালির ইতিহাস (আদি পর্ব) নীহার রঞ্জন রায়, পৃ-৭৫।

[v] বাঙ্গালার ইতিহাস (প্রথম পর্ব) সংগ্রহ ও সম্পাদনা কমল চৌধুরী, পৃ-৩৮৭।

[vi] বাঙ্গালার ইতিহাস (প্রথম পর্ব) সংগ্রহ ও সম্পাদনা কমল চৌধুরী, পৃ-৩৮৭।

[vii] মধ্যযুগের সাহিত্যে বাঙালী সমাজ ও সংসস্কৃতি, প্রণব কুমার সিংহ- পৃ-৩৫।

গ্রন্থপঞ্জি

১) অতুল সুর, ‘বাঙলা ও বাঙালির বিবর্তন’, সাহিত্যলোক, চতুর্থ সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১২, কলকাতা।

২) নীতিশ সেনগুপ্ত, ‘বঙ্গভূমি ও বাঙালির ইতিহাস’; দে’জ পাবলিশিং, মার্চ ২০০৮, কলকাতা।

৩) নীহার রঞ্জন রায়, ‘বাঙ্গালীর ইতিহাস’ (আদি পর্ব), দে’জ পাবলিশিং, সপ্তম সংস্করণ, ফাল্গুন ১৪১৬, কলকাতা।

৪) বিনয় ঘোষ, ‘পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি’ (১ম খন্ড), প্রকাশ ভবন, দ্বিতীয় সংস্করণ, সপ্তম মুদ্রণ, মার্চ ২০১০, কলকাতা।

৫) বিনয় ঘোষ, ‘পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি’ (২য় খন্ড), প্রকাশ ভবন, চতুর্থ মুদ্রণ, মার্চ ২০০৮, কলকাতা।

৬) মমতা বৈষ্ণব, ‘রাঢ় বাঙ্গালার ইতিহাস ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য’, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ডিসেম্বর ১৯৯৬, বর্ধমান।

৭) যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, ‘রাঢ়ের সাংস্কৃতিক ইতিহাস’, নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদ, ডিসেম্বর ২০০৮, নবদ্বীপ।

৮) রুমা বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘মঙ্গলকাব্যে নিম্নবর্গের অবস্থান’, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০০৯, কলকাতা।

৯) সনৎ কুমার নস্কর (সম্পাঃ), ‘কবিকঙ্কন চন্ডী’, রত্নাবলী, তৃতীয় সংস্করন, ডিসেম্বর ২০০৫, কলকাতা।

১০) সুকুমার সেন (সম্পাঃ), ‘কবিকঙ্কন কবি মুকুন্দ বিরচিত চন্ডীমঙ্গল’, সাহিত্য অকাদেমি, পঞ্চম মুদ্রণ, ২০০৭, কলকাতা।

১১) আশুতোষ ভট্টাচার্য, ‘বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস’, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, সপ্তম সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ডিসেম্বর ১৯৮৯, কলকাতা।